ভারত ও বিশ্বের ইতিবৃত্ত

অধ্যাপক গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী

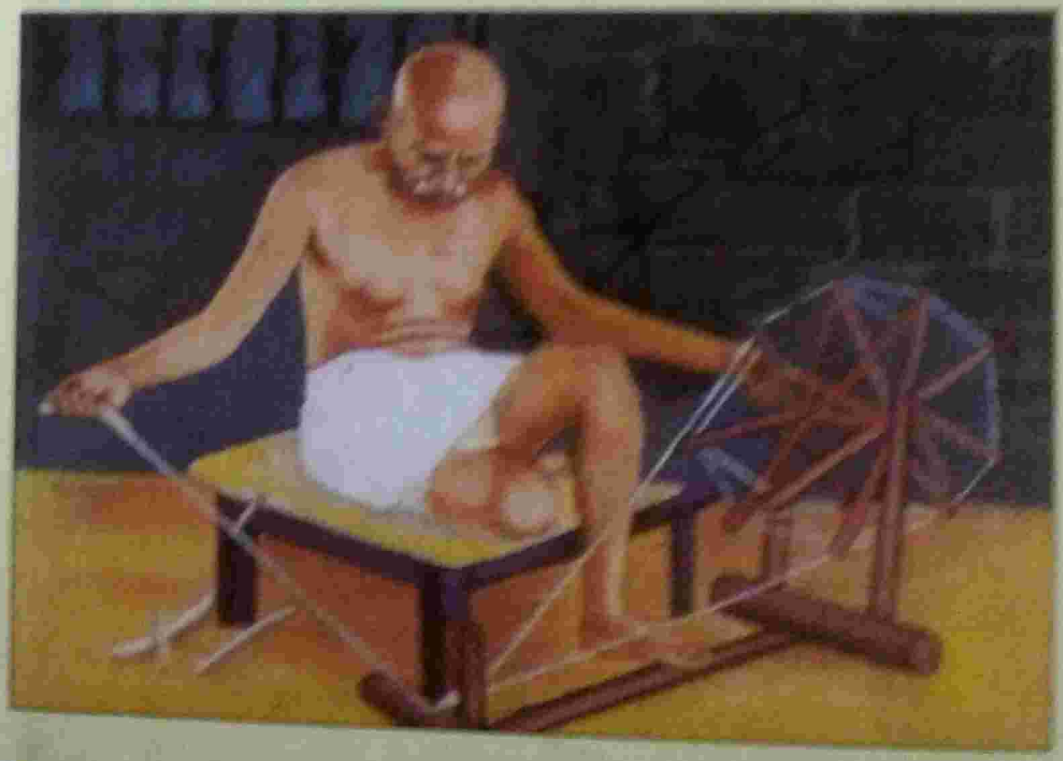

পরিস্থিতির ওপর আমাদের জোটনিরপেক্ষ নীতি ... হয়েছে, ফলে আরও বেশি দেশ এই নীতিতে আকৃষ্ট হবে। দ্বিমেরু জগতে জোটনিরপেক্ষতা উপলব্ধি সহজতর হতে পারে, কিন্তু বহুকেন্দ্রিক (Polycentric) জগতে তা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।" এমনকি, একমেরুকরণ (Unipolar) ব্যবস্থার দাপুটে কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রেও নির্জোট ব্যবস্থা কার্যকরী হতে সক্ষম। তাই অধ্যাপক পান্ত লিখেছেন, *"বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় বিদেশনীতিকে কেবল 'জোটনিরপেক্ষতা' না-বলে 'বাস্তবসম্মত' (Pragmatic) নীতি নামে চিহ্নিত করা যায়।"*

ভারতে নেহরু যুগ—একটি সমীক্ষা ঃ

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে 'গান্ধিযুগ' কথাটি যেমন গভীরভাবে জড়িত, তেমনি স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম পর্বটির সাথে 'নেহরু-যুগ' কথাটি ঘনিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয়। বস্তুত চল্লিশের দশকে প্রাক্‌স্বাধীন ভারতীয় রাজনীতিতেও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধি, সুভাষচন্দ্র বসু, মহম্মদ আলি জিন্নাহ প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাথে নেহরুও একজন অগ্রণী কংগ্রেস কর্মী হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। অসংখ্য তারকার মাঝে তিনি ছিলেন একটি তারকা মাত্র। কিন্তু ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি যখন আততায়ীর অপ্রত্যাশিত আঘাতে গান্ধি চলে গেলেন, তখন হতভম্ব, বাক্‌রুদ্ধ দেশবাসীর মনে একটাই প্রশ্ন—'জাতির জনক নেই। এখন কে আমাদের নেতৃত্ব দেবেন!' সদ্য স্বাধীন, সমস্যাজর্জরিত ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তখন দিক্‌নির্দেশক ধ্রুবতারার মতোই জওহরলাল নেহরুর উদয় ঘটে। সেই সময় থেকে আমৃত্যুকাল (১৯৬৪ খ্রিঃ) নেহরুই ছিলেন ভারতের মুখ্য পরিচালক। দলীয় রাজনীতি, সংসদীয় ব্যবস্থা, যৌথ নেতৃত্ব ও দায়বদ্ধতা ইত্যাদি আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্বের মাঝেও

নেহরু ছিলেন একক মহিমা ও কর্তৃত্বে উজ্জ্বল। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিদেশনীতি ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আদর্শবাদ, চিন্তাভাবনার প্রকাশ স্পষ্ট দেখা যায়। কোনো অর্থেই নেহরু 'স্বৈরতন্ত্রী' ছিলেন না ; কিন্তু তিনিই ছিলেন দেশের মুখ্য কর্ণধার। তাই তাঁর আমল ভারতে 'নেহরু-যুগ' নামে অভিহিত হয়।

জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রিঃ)-র শিক্ষালাভ ঘটেছে লন্ডনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। হ্যারো, কেম্ব্রিজ এবং টেম্পল ইন তাঁর মননশীলতার বিকাশে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। স্বভাবতই যুবক নেহরুর রাজনৈতিক মননের ওপর ইংল্যান্ডে বৌদ্ধিক জীবনের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডল। পিতা মতিলাল নেহরু ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ও রাজনীতিক। পারিবারিক আভিজাত্য ও উদারতা এবং ভারতের ঔপনিবেশিক আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে ইংল্যান্ডে সংসদীয় ব্যবস্থার অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে নেহরুর রাজনৈতিক দর্শন গড়ে ওঠে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাস্তবতা এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সম্ভাবনা ও আকর্ষণ তাঁকে বার বার টানাপোড়েনের মধ্যে ফেলেছে। তবে শেষ পর্যন্ত এই স্থিতধী ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিক ভারতের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি ও আধুনিক উদারতাবাদী রাষ্ট্র-দর্শনের সমন্বয়ে প্রতিক্ষেত্রেই কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছেন। কাশ্মীরি পন্ডিত বংশের এই কৃতি সন্তান জ্ঞান-গরিমাতেও ছিলেন যথার্থ পন্ডিত। প্রথম জীবনে প্রবন্ধকার হিসেবে 'হিন্দু' ও 'Young India' পত্রিকায় নিজের লেখনীর জোর প্রকাশ করেন। কন্যা ইন্দিরার বয়স যখন মাত্র দশ বছর তখন জওহরলাল কন্যার উদ্দেশ্যে লেখেন *'Letters from a Father to his Daughter'* শীর্ষক পত্রাবলি। স্বকাল ও স্বদেশ সম্পর্কে তাঁর গভীর চিন্তাভাবনার আন্তরিক ছবি এই পত্রাবলিতে পাওয়া যায়। ইতিহাসমূলক গ্রন্থ 'Glimpses of World History' এবং 'Whither India' গ্রন্থ দুটি তাঁর খ্যাতি ছড়ায়। কয়েক বছর পরে তিনি লেখেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'Antobiography' এবং 'The Discovery of India'। জওহরলালের রাজনৈতিক আদর্শবাদ, মতাদর্শের অস্থিরতা, ব্যক্তিগত আবেগ ইত্যাদির আভাস এই রচনাবলিতে পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে যে, নেহরু প্রধানমন্ত্রী না হলেও, একজন লেখক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।[১]

নেহরুর রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তী এক দশকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পুষ্ট হয়। গান্ধির অহিংস নীতির গভীরতার প্রতি আস্থা, ভারতীয় সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও কুপ্রথাগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, কৃষক, শ্রমিক এবং যুবসম্প্রদায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সমন্বয়ে নিজের চিন্তা-চেতনাকে পুষ্ট করে তিনি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র নির্মাণের তাত্ত্বিক হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে রাজনীতিক হিসেবে তাঁর মতাদর্শ অনেকটাই পরিণত রূপ পায়। ১৯২৭-এ নেহরু রাশিয়া পরিভ্রমণ করে সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে তাঁর অধিষ্ঠান

১। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড) পৃঃ ১৮৪।

নেহরুকে নেতৃত্বের আসনে উত্তীর্ণ করে। স্বভাবতই জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মসূচিতে শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নবর্ণের বামপন্থী রাজনীতির প্রবেশের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আস্থার কারণে সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতি নেহরুর সমর্থন ছিল সুবিদিত। কিন্তু দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস গোষ্ঠীর সমর্থন কিংবা গান্ধিজির ডানমার্গী প্রভাব অস্বীকার করার দৃঢ়তা তিনি দেখাতে পারেননি। তাই সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদ ও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথাগত রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় বিধান করার চেষ্টা ছিল নেহরুর রাজনীতির অভিনব বৈশিষ্ট্য।

১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭ সময়কালে ভারতীয় ও বিশ্বরাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ নেহরুর রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফ্যাসিবাদের উত্থান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিশ্চিত গতিপ্রকৃতি, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের টানাপোড়েন এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঠিক পথ সম্পর্কে নেতৃত্বের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ এবং ফ্যাসিস্ট শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ-বিতাড়নের প্রয়াস, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্ততা ও লাগামছাড়া জাতীয় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা ইত্যাদি অন্যান্য নেতাদের মতো নেহরুকেও চরম বিভ্রান্তি ও দোদুল্যমানতার মধ্যে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তবে এই অস্থির মুহূর্তে সরকার তাঁকে কারান্তরালে থাকতে বাধ্য করলে, বাস্তব রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনিও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাত্ত্বিক চিন্তায় মগ্ন থাকতে বাধ্য হন। ১৯৪৫-এ নেহরু কারাগার থেকে মুক্ত হন। পরবর্তী দুবছর ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করার কাজে নেহরুকে অগ্রণী তথা নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিতে হয়।

স্বাধীনোত্তর ভারত-রাষ্ট্র দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার সাথেই রাষ্ট্রপরিচালনার আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে 'সংসদীয় গণতন্ত্র'কে গ্রহণ ও লালন করতে শুরু করে। সারা বিশ্বে আদর্শ সংসদ ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের পীঠস্থান হিসেবে ভারতের নাম উচ্চারিত হয়। পণ্ডিত নেহরু প্রাক্‌স্বাধীন ভারতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতেও তাঁর আসন অটুট ছিল। আমৃত্যুকাল (১৯৬৪ খ্রিঃ) নেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পর্বে (১৯৪৭-৬৪ খ্রিঃ) আমরা জওহরলাল নেহরু'র এক নতুন সত্তার সন্ধান পাই। জনপ্রিয় রাজনীতিক, সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী, দক্ষ কূটনীতিক, কুশলী সাংসদ এবং সর্বোপরি সর্বজনগ্রাহ্য জননেতা হিসেবে তিনি দেশে ও বিদেশে খ্যাতি পান। সদ্যস্বাধীন সমস্যাকীর্ণ বহুত্ববাদী ভারত-রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য যে আন্তরিক দেশপ্রেম, সূক্ষ্ম কূটনীতিজ্ঞান, ধৈর্য, সহনশীলতা, সামাজিক দূরদৃষ্টি ও সুগভীর রাষ্ট্রপ্রজ্ঞার প্রয়োজন, তা সবই নেহরুর চরিত্রে সমন্বিত হয়েছিল।

স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র নির্মাণের কাজে নেহরুর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় যথেষ্ট প্রাপ্তির মুহূর্তেই পাওয়া যায়। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক, আর্থিক বা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ স্থির করার বিষয়ে গান্ধিসহ জাতীয় নেতারা চিন্তাভাবনা করছিলেন। এই বিষয়ে মতবিনিময় ও গতিপথ নির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে গান্ধিজি স্বয়ং ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে একটি সম্মেলন ডাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আকস্মিক জীবনাবসানের (৩০ জানুয়ারি) ফলে তা বাস্তবায়িত হয়নি। অবশেষে ১১ মার্চ এমনই একটি বৈঠক আহূত হয়। পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ, আচার্য বিনোবাভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রাজেন্দ্র প্রসাদ-সহ শীর্ষস্থানীয়

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই বৈঠকে অংশ নেন। স্বাধীন ভারতের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনার শেষে দুটি পৃথক অভিমত উঠে আসে। গান্ধিবাদী নেতা বিনোবাভাবে সংগঠনগতভাবে কংগ্রেসকে প্রশাসনিক কাজ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, কংগ্রেসের উচিত গঠনমূলক সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণে নিয়োজিত থাকা। শিক্ষাবিস্তার, নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ইত্যাদি মানবিক ও সামাজিক সংস্কারের কাজে কংগ্রেসকে নিয়োজিত থাকার আহ্বান জানান। কিন্তু কংগ্রেসের একাংশ জওহরলালের সাথে একমত হয়ে দাবি তোলেন যে, দেশকে স্বাধীন করার জন্য কংগ্রেস দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়েছে। এখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই জাতীয় কংগ্রেস তার রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না। দেশ তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করেছে, কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে স্থায়ী ও সুদৃঢ় করা আরও কঠিন কাজ। জাতীয় কংগ্রেস সেই চ্যালেঞ্জ করে তার দেশপ্রেম প্রমাণ করুক। স্বাধীন ভারতের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেই কংগ্রেস তার দায়বদ্ধতা প্রমাণ করতে পারে। এমতাবস্থায় গান্ধিজির ইচ্ছানুযায়ী আচার্য বিনোবাভাবে 'সেবাদল' গঠন করে সামাজিক সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অন্যদিকে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশ গঠনের কাজ শুরু করেন।

আধুনিক ভারতের প্রধান রূপকার নেহরু। *'Discovery of India'* গ্রন্থে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, বর্তমান বিশ্ব, আধুনিক জীবনধারা, অসীম বৈচিত্র্যময় বিশ্বকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পেছনে ফিরে তাকানোর কোনো সুযোগ নেই ("We have to come to grips with the present, this life, this world, this nature which surrounds us in it, infinite variety ... there is no going back to the fast... .")। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন যে, ভারতকে যথার্থ মহান হতে গেলে কোনো কিছুকেই অনিবার্য বলে আঁকড়ে থাকা চলবে না। যা কিছু চিন্তা, চেতনা, মননশীলতা, কিংবা সামাজিক প্রগতির প্রতিবন্ধী, সেসব বর্জন করতে হবে। গান্ধিবাদের প্রতি ছিল তাঁর শ্রদ্ধা, মার্কসবাদের প্রতি ছিল আস্থা। কিন্তু কোনো মতাদর্শকেই নেহরু অনিবার্য বলে গ্রহণ করেননি। দেশ, জাতি ও আধুনিকতার সাথে যেগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাকেই তিনি গুরুত্ব দিতেন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিউগ টিন্‌কের (Hugh Tinker) তাঁর *'Is there An Indian Nation'* শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, *"নেহরুর বিরোধীরাও এমন অভিযোগ করতে পারেননি যে, নেহরু জাতীয় স্বার্থের বাইরে কিছু চিন্তা করতেন। কোনও বিশেষ ধর্ম, জাতি, শহর বা ভাষার প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল না ; নেহরুর চেতনায় প্রথম ছিল ভারত এবং শেষ ছিল ভারত"* (*"Even his enemies could never accuse him of thinking in any but national terms ; caste, creed, town, tongue—none of there loyalities meant anything to him ; it was India first and India last."*)[1]। গণতন্ত্র, আইনের শাসন, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং যুক্তিবাদ ইত্যাদি ছিল রাষ্ট্র গঠনের কাজে তাঁর মৌলিক

1. Philip Mason (ed) : India and Cylone : Unity and Diversity (1967), P. 287.

স্তম্ভ। এই কাজে নেহরুর প্রধান শক্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সততা এবং ভারতীয় জনগণের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা ও ভালোবাসা।

গণতন্ত্র ও সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি নেহরুর দায়বদ্ধতা ছিল সার্বিক। দলীয় গণতন্ত্রে ছিল তাঁর আস্থা। নেহরু স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারও কিছু ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে। তবে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক অধিকার সংরক্ষণের কাজে এই ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। কোনো কিছুর জন্যই তিনি গণতান্ত্রিকতার পথ ও আদর্শ বর্জন করতে রাজি ছিলেন না। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে নেহরু প্রায় একক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভ তাঁর গণতান্ত্রিক চেতনাকে সামান্যভাবেও ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। বিপান চন্দ্রের মতে, দলের অভ্যন্তরে কিংবা সংসদীয় ক্ষেত্রে নেহরু আমৃত্যু গণতান্ত্রিকতা ও সামাজিক স্বাধীনতার বার্তা প্রেরণ করেছেন। স্বাধীন ভারতের শাসনক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রীকরণ সুনিশ্চিত করার কাজেও তিনি আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন। একটি উদার সংবিধান, সার্বভৌম সংসদ, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, নিয়মিত নির্বাচন, মুক্ত সংবাদমাধ্যম এবং মন্ত্রিপরিষদ-এর তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করার কাজে নেহরুর আন্তরিকতা সুবিদিত। মূলত গ্রেট ব্রিটেনের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই তিনি মডেল হিসেবে গ্রহণ করেন। তাই 'ব্যক্তি' হিসেবে প্রতিটি নাগরিকের পৌর অধিকার (Civic rights) সংরক্ষণ করার বিষয়টিকে নেহরু বিশেষ গুরুত্ব দেন। এজন্য তিনি রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত পৌরাণিক বা মধ্যযুগীয় গোষ্ঠীধর্ম বা জাতি, বর্ণভিত্তিক সংকীর্ণ চেতনাসমূহকে সরাসরি আক্রমণ করার বিরোধীও ছিলেন। আর্থিক ও সামাজিক প্রগতি সুনিশ্চিত করে নেহরু অভ্যন্তরীণ ঐক্য অটুট করার পক্ষপাতী ছিলেন। সংসদে বিরোধী নেতাদের পূর্ণ মর্যাদা প্রদানের বিষয়ে নেহরু ছিলেন দৃষ্টান্তস্বরূপ। বিরোধী নেতাদের বক্তব্য মনযোগ দিয়ে শোনা এবং যুক্তি-তথ্য দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করার কাজে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। একথা হয়তো ঠিক যে, নেহরুর আমলে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের আড়ালে জাতীয় কংগ্রেসের একদলীয় কর্তৃত্ব এবং আরও নির্দিষ্টভাবে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর একক কর্তৃত্ব অব্যাহত ছিল। নেহরু নামের যাদু তখন সারাদেশের মানুষকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা নেতার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যেত না। কিন্তু এই কারণে জওহরলাল নেহরুর কৃতিত্বকে ছোটো করা যায় না। ১৯৫১-তে তিনি বলেছিলেন যে, *"আমাদের গণতন্ত্র একটি শিশু-বৃক্ষ, যাকে আন্তরিক ভালোবাসা দিয়ে পত্র-পুষ্পে সুশোভিত করে তোলা দরকার"* (*"Our democracy is a tender plant whichi has to be no wished with wisdom and care."*)। এই বক্তব্যকে বাস্তবায়িত কবার কাজে নেহরু আজীবন আন্তরিক ছিলেন।

পণ্ডিত নেহরু কুড়ির দশকে রুশ সমাজতন্ত্রের সংস্পর্শে আসেন এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় হিসেবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি গণতান্ত্রিক রাজনীতির মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন। সমাজতন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে নেহরুর ধারণা কী ছিল, এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তবে শ্রেণিসংঘাত, সর্বহারাদের বিপ্লব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর আপত্তি ছিল স্পষ্ট। তাঁর কর্মধারা থেকে অনুমান করা যায় যে, সমাজতন্ত্র বলতে তিনি বুঝতেন শ্রেণিভেদাভেদ ও শ্রেণিকর্তৃত্বের ক্রমিক অবসান, সকলের

সমান সুযোগ, উৎপাদনের যথাসম্ভব সমবন্টন ইত্যাদি। নেহরু মনে করতেন যে, দারিদ্র্যের সমবন্টন সম্ভব নয়। তাই তিনি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর বেশি জোর দেন। অর্থাৎ একই সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমবন্টন ব্যবস্থার সমন্বয় দ্বারা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা তিনি ভেবেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পশ্চাৎপটে কোনো সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনা নেহরু গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করতেন, একের পর এক সংস্কার দ্বারা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা বিধেয়। প্রচলিত আর্থসামাজিক কাঠামোর মধ্যেই এই সকল সংস্কার সমন্বিত হয়ে অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক রূপান্তর নিয়ে আসবে। নেহরু এই সংস্কারকে বলেছেন, 'Surgical operating'। নেহরুর 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'কে কেউ কেউ 'সোনার পাথরবাটি' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। আসলে ইংল্যান্ডে শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠা এবং উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধি নেহরুর রাজনৈতিক তত্ত্বতালাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। শ্রেণিসংঘাত বা সমাজ-বিপ্লবের পরিবর্তে নেহরু স্বাভবিক কারণেই সংস্কারের পথে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পথ নিয়েছিলেন। ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা তিনি করে যেতে পারেননি—এ কথা ঠিক, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে সামাজিক জনপ্রিয়তা প্রদানের কাজে তিনি নিশ্চই সফল ছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্য অটুট রাখার জন্য নেহরু দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেন। জাতীয় কংগ্রেসের 'আবাদি' সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে, আর্থিক সমৃদ্ধি ছাড়া ভারতের পক্ষে 'কল্যাণকামী রাষ্ট্র' (Welfare State) হয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। বর্তমান ভারতে ভাগ করে নেবার মতো সম্পদ নেই, আছে কেবল দারিদ্র্য। সম্পদ ব্যতিরেকে কল্যাণকামী রাষ্ট্রগঠনের ধারণা অলীক মাত্র। 'Discovery' গ্রন্থে নেহরুর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশদ ধারণা পাওয়া যায়। তিনি ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তরের নাম দেন 'গণতান্ত্রিক সমষ্টিবাদ'। এই তত্ত্বানুসারে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ হবে না, কিন্তু মৌল ও ভারী শিল্পে রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকবে। পাশাপাশি সমবায়ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প স্থাপিত হবে। নেহরুর আর্থসামাজিক ভাবনায় সমাজতন্ত্র ছিল কিছুটা রোমান্টিক ধাঁচের বিষয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কিংবা ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী কর্তৃত্ব তিনি পছন্দ করতেন না। আবার কঠোরভাবে ব্যক্তিগত অধিকার বা উদ্যোগকে বিনাশ করে একটা নির্দয় সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রবল দ্বিধা ছিল। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং 'মিশ্র অর্থনীতি' প্রয়োগের ওপর জোর দেন। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশাসন, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, সেচ ইত্যাদিকে বিশেষ গুরুত্ব দানের কথা ভাবা হয়। এর সুফল ধনী-দরিদ্র সবাই ভোগ করার সুযোগ পাবে। শিল্পবিরোধের মীমাংসায় রাষ্ট্র মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। তাহলে শ্রেণিসংঘাতের সম্ভাবনা শিথিল হবে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে জমির ওপর রাষ্ট্রের অধিকার বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করা হয়। উদ্বৃত্ত জমি (খাসজমি) ভূমিহীন বা দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে বৃহৎ ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব ও শোষণ শিথিল করা সম্ভব হবে। এইভাবে মধ্যপন্থী সংস্কার ও মিশ্র অর্থনীতির প্রয়োগ করে নেহরু স্বাধীন ভারতের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে উদ্যোগী হন।

'ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতির সম্পর্কের জটিলতা মধ্যযুগের শুরু থেকেই ভারতীয় রাজনীতির একটি বিতর্কিত প্রবণতা হিসেবে বহুচর্চিত একটি বিষয়। 'রাজার ধর্ম, প্রজার ধর্ম'—এমন

ইউরোপীয় ধারণা বহু আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বহুধর্মচর্চিত ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে ধর্মকে হাতিয়ার করে কোনো গোষ্ঠী বা দলের বা ব্যক্তির ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা স্পষ্ট। তাই রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে ব্যক্তি জওহরলালের ধর্মভাবনা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বলাবাহুল্য, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও যুক্তিবাদে দীক্ষিত নেহরু স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই সংকীর্ণ ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও হিংসাত্মক দাঙ্গার বিরুদ্ধে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। গান্ধিজির একান্ত অনুগত নেহরু ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক বিষয়ে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করতেন। গান্ধিজি ধর্মবিচ্ছিন্ন রাজনীতিকে আদর্শ ব্যবস্থা মনে করতেন না। তাঁর মতে, ধর্ম একটা ইতিবাচক, আদর্শবাদী ও মূল্যবোধভিত্তিক আচার। তাই নিজধর্মে আস্থা বজায় রেখে পরধর্মসহিষ্ণু হলে ধর্মচর্চাও রাজনীতির ভিত্তি হিসেবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে। গান্ধি বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মনির্ভর রাজনীতি নয়, ধর্মহীনতাই বিদ্বেষের জন্ম দেয়। কিন্তু নেহরু মনে করতেন যে, ধর্মাচরণ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্র সমস্ত ধর্মীয় বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকবে। সকল ধর্মমতের প্রতি রাষ্ট্র সহিষ্ণু হবে এবং সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য সমান রাষ্ট্রীয় সুযোগসুবিধা বন্টনের কাজে রাষ্ট্র দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। তবে নেহরুর রাজনীতিতে ধর্মের প্রয়োগের তাত্ত্বিক আদর্শ সবক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কেরলে ক্ষমতা দখলের প্রয়োজনে মুসলিম লিগ ও খ্রিস্টানদের ধর্মভিত্তিক দলের সাথে হাত মিলিয়ে তিনি নিজেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির তাত্ত্বিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। মুসলমানদের প্রতি তাঁর নীতি সম্পূর্ণরূপে 'এক দেশ-এক জাতি' তত্ত্ব দ্বারা সমর্থিত ছিল না। নেহরু হিন্দু আইনবিধির কথা বললেও, মুসলিম আইনবিধির ওপর হস্তক্ষেপ করেননি। শরিয়তি আইনের প্রয়োগ কিংবা মুসলিম বিবাহ আইন সংস্কারের বিষয়ে তিনি সচেতন উদাসীনতা প্রকাশ করেছেন। নেহরুর আমলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও সংঘর্ষ নিরসনের ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ বা সাফল্য দেখা যায় না।

নেহরু যে স্বপ্নের ভারত গড়তে চেয়েছিলেন, তাতে তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে নানা অভিমত আছে। সদ্যস্বাধীন একটি সমস্যাজর্জরিত দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিঃসন্দেহে তাঁর কাজের চাপ ছিল অস্বাভাবিক ভাবে বেশি এবং জটিল। তিনি একনায়ক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর অসীম ব্যক্তিত্ব সকল সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে তাঁকেই প্রতিস্থাপন করেছিল। ফলে দায়িত্বভার ও একক মানসিক শক্তির অসাম্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেহরুকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেয়নি। বিপান চন্দ্র লিখেছেন যে, নেহরু তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করতে পারতেন। মানুষের চাহিদা বোঝার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর ছিল। কিন্তু মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর কাজেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কিন্তু একজন দক্ষ রাজনীতিকের মতো লক্ষ্যে পৌঁছানোর কৌশল ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নেহরু সফল হননি। নেহরু একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশের দুর্বলতা ও সমস্যাগুলিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। সারাদেশকে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় স্বপ্ন দেখাতেও পেরেছিলেন। তাই বিপান চন্দ্র লিখেছেন, *"Measured by any historical standards his achievement were of gigantic proportions."*